শিকড়ের সন্ধানে

সমকালীন প্রকাশন

সূচিপত্র

সূচনা	২১
বনি ইসরাইলের পরিচয়	২৫
শাম ও মিশরের যোগসূত্র	৩০
নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে মুসা আলাইহিস সালামের কাহিনি	৩৩
নবুওয়াত-পরবর্তী মুসা আলাইহিস সালামের কাহিনি	৩৭
মুসা আলাইহিস সালামের মিশর-ত্যাগ ও ফিরাউনের পতন	৪৩
প্যালেস্টাইনের পথে বনি ইসরাইলের যাত্রা	৪৭
নির্বাসনের ৪০ বছর	৫৩
বনি ইসরাইলের জেরুজালেমে প্রবেশ	৮১
বনি ইসরাইলের পদস্খলন	৮৯
বাদশাহ তালুত ও তার নেতৃত্বে জয়লাভ	৯৫
দাউদ আলাইহিস সালামের শাসনকাল	১০১
সুলাইমান আলাইহিস সালামের শাসনকাল	১০৫
জিনজগৎ ও সুলাইমান আলাইহিস সালাম	১১৯
সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুপরবর্তী অবস্থা	১৩৪
বনি ইসরাইল থেকে ইহুদি হয়ে যাওয়া	১৪৪

ইহুদি এবং খ্রিষ্টান : এক উম্মাহর বিভাজনের পটভূমি ১৫৩
ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম ১৬৫
ঈসা আলাইহিস সালামের মুজিযাসমূহ ১৭৮
উম্মাহর দুই ভাগে বিভক্ত হওয়া ১৮৩
উম্মাহর তিন ভাগে বিভক্ত হওয়া ১৮৮
খ্রিষ্টধর্মের মূলনীতি এবং বাইবেল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ২০৬
বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রিত্ববাদের পর্যালোচনা ২১০
ঈসা আলাইহিস সালামই কি আল্লাহ! ২১৬
ঈসা আলাইহিস সালাম কি আল্লাহর ছেলে! ২২০
আদি পাপ : বাইবেলের আলোকে আলোচনা ২২৫
আদি পাপ : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ২২৯
ক্রুশবিদ্ধের ঘটনা : বাইবেল যা বলে ২৩৩
ক্রুশবিদ্ধের ঘটনা : ইসলাম যা বলে ২৩৭
বাইবেলের আলোকে বর্তমান খ্রিষ্টানদের জীবনযাত্রা ২৫০
খ্রিষ্টধর্মের বিবর্তন : বিকৃতির অনুসন্ধান ২৫৪
বাইবেলে শেষ নবির আগমন-বার্তা ২৬৬
এক সূত্রে গাঁথা সবকিছু ২৭৪
তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব : আমাদের জীবনে এর প্রাসঙ্গিকতা ২৭৮
নির্ঘন্ট ২৮৮

বনি ইসরাইলের পরিচয়

বইটি আমরা বনি ইসরাইলের কাহিনি দিয়ে শুরু করছি, তার কারণ মূলত দুটি—

এক. বনি ইসরাইলের ইতিহাস জানলে অল্প সময়ে কুরআনের বিশাল একটি অংশ বোঝা যাবে।

দুই. বনি ইসরাইলের কাহিনি ধারাবাহিকভাবে না জানলে কুরআনে এতৎসংশ্লিষ্ট অংশ বুঝতে পারা কঠিন হয়ে যাবে। এ ছাড়া অন্য কাহিনিগুলো এমন নয়।

বনি ইসরাইল কারা?

বনি ইসরাইল কারা—এটা জানতে হলে প্রথমেই আমাদের ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে জানতে হবে। আমরা হয়তো অনেকেই জানি, ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে 'Father of faith' বলা হয়। একেশ্বরবাদী হিসেবে দাবি করা তিনটি প্রধান ধর্ম—ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম; সবগুলোতেই তিনি স্বীকৃত ও সম্মানিত। সবাই তাকে নিজেদের ধর্মের অনুসারী হিসেবে দাবি করে। এই টানাহ্যাঁচড়াকে খণ্ডন করে দিয়ে আল্লাহ কুরআনে তাকে আখ্যায়িত করছেন 'হানিফ'[১] হিসেবে।

---

[১] ইবরাহিম ইহুদি কিংবা নাসারা ছিলেন না, বরং তিনি তো একজন 'হানিফ' এবং তিনি কখনোই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নন।[সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৬৭] হানিফ বলতে ওই ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি বাতিল দ্বীন থেকে বিশুদ্ধ দ্বীনের দিকে ধাবিত হন।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বাবা ছিলেন একজন মূর্তিপূজক।[১] অপরদিকে তিনি এক আল্লাহতে বিশ্বাসী। একত্ববাদের বাণী প্রচার করতে গিয়ে স্বভাবতই তৎকালীন রাজার সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন।[২] তার সম্প্রদায়ের লোকেরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাওহিদের বাণী থেকে।[৩] আল্লাহর নির্দেশে তখন হিজরত করেন তিনি। সাথে কেবল স্ত্রী সারাহ এবং ভাইয়ের ছেলে লুত আলাইহিস সালাম।[৪] হিজরতকালে তারা এমন এক জনপদে এসে হাজির হন, যেখানকার শাসক ছিল ভীষণ লম্পট আর অত্যাচারী। সুন্দরী নারীদের সে কুক্ষিগত করে রাখত এবং তাদের স্বামীদের নির্বিচারে হত্যা করত। যেহেতু ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দাওয়াত-গ্রহণকারীদের মাঝে সারাহ-ই একমাত্র নারী, তাই তিনি জীবন বাঁচানোর জন্য তাকে (দ্বীনি অর্থে) নিজের বোন বলে পরিচয় দেন।[৫]

তারপরও সেই শাসক সারাহকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করে। সারাহ আল্লাহর কাছে দুআ করেন। এতে শাসকের হাত সঙ্গে সঙ্গে অবশ হয়ে যায়। শাসক মিনতিভরে ক্ষমা চায় সারাহর কাছে। সারাহ দয়াপরবশ হয়ে রবের কাছে শাসকের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেন। শাসক সুস্থ হয়ে পুনরায় একই পাপকাজে সফল হবার প্রচেষ্টা চালায়। এভাবে তিনবারের বেলায় তার শিক্ষা হয়। অগত্যা সে সারাহকে ছেড়ে দেয় এবং উপহার হিসেবে প্রদান করে হাজেরাকে,[৬] যিনি ছিলেন ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মালাকাত আঈমানুহু।[৭] হাজেরা ও সারাহর গর্ভ থেকে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দুটি বংশধারার সৃষ্টি হয়। একটি ধারা তৈরি হয় ইসমাইল আলাইহিস সালামের দ্বারা (বিবি হাজেরার গর্ভ থেকে), আরেকটি ইসহাক আলাইহিস সালামের দ্বারা (সারাহর গর্ভ থেকে)।

---

[১] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৪১-৪৩

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৫৮

[৩] সুরা শুআরা, আয়াত : ৬৯-৭৪; সুরা আনআম, আয়াত : ৭৭-৭৮; সুরা আনকাবুত, আয়াত : ১৬-১৯

[৪] সুরা আনকাবুত, আয়াত : ২৬; তাফসির দ্রষ্টব্য

[৫] *সহিহ বুখারি :* ২২১৭ (ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়)

[৬] *সহিহ বুখারি :* ২২১৭ (ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়)

[৭] এখানে প্রচলিত শব্দ 'দাসি'র বদলে কুরআনীয় টার্ম 'মালাকাত আইমানুহু' ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, আমাদের দেশে অনেক সময় গৃহকর্মীদেরও দাসি হিসেবে অভিহিত করা হয়, ফলে ইসলামে দাসপ্রথার ফিকহ নিয়ে অযথা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

এখন আমরা দেখব—সকল ধর্মের মূলে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম কীভাবে জড়িত ছিলেন। মাঝখানে অনেকে থাকলেও মূলত ক্রমটা এ রকম—

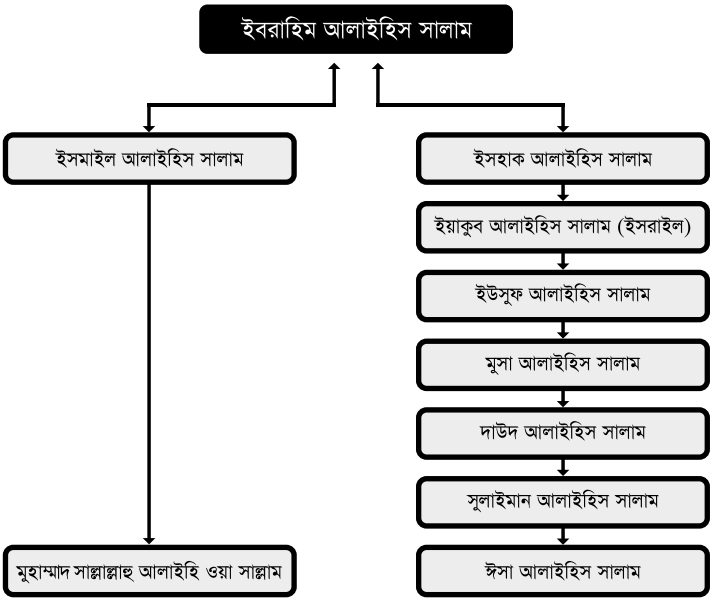

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বনি ইসরাইল মূলত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর। এদের বনি ইসরাইল বলার কারণ হচ্ছে—ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আরেক নাম ছিল ইসরাইল। এই বংশ থেকে অসংখ্য নবির আগমন ঘটেছে; কিন্তু ইসমাইল আলাইহিস সালাম থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত মাঝে আর কোনো নবির আগমন ঘটেনি। তাই এ ধারাকে বলা যেতে পারে বনি ইসমাইল।

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের প্রথম সন্তান ছিলেন ইসমাইল আলাইহিস সালাম। আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার দুধের শিশু ইসমাইল ও স্ত্রী হাজেরাকে আরব মরুভূমির জনমানবহীন প্রান্তরে রেখে আসেন। পানির সন্ধানে হাজেরা সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে উদ্বিগ্ন হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকেন; যা পরবর্তীতে হজের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গে পরিণত হয়। এটি পালনের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ আজও হাজেরাকে স্মরণ করে বিনম্র শ্রদ্ধায়। আল্লাহর অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে এ সময় সৃষ্টি হয় জমজম কূপ, যাকে কেন্দ্র করেই জনশূন্য মরুভূমি পরিণত হয় জনবহুল শহরে। ইসমাইল আলাইহিস সালামের উত্তরসূরিরাও সেখানেই

বেড়ে উঠতে থাকে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।[১]

এদিকে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করতেন শামে—যা এখনকার সিরিয়া, জেরুজালেম-সহ বিশাল একটি জায়গা নিয়ে গঠিত ছিল। ফেরেশতারা যখন লুত আলাইহিস সালামের জাতিকে ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হলেন, সেই একই সময়ে তারা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে সারাহর গর্ভে ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দেন।[২]

এভাবে মক্কায় বনি ইসমাইল এবং শাম দেশে বনি ইসরাইলের বংশধরগণ বাস করতে থাকে।

বনি ইসরাইলের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য

নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালো জানেন, কেন তিনি কুরআনের এত বিশাল একটি অংশ জুড়ে বনি ইসরাইলের কাহিনি উল্লেখ করার সিদ্ধান্ত নিলেন; কিন্তু আলিমগণ বনি ইসরাইলের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যকে এর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন—

» সময়ের দিক থেকে আমরা ও তারা সবচেয়ে কাছাকাছি। ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঠিক আগের নবি এবং তার জাতিও বনি ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত।

» রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের পর এটাই সবচেয়ে বড় উম্মত (সংখ্যার দিক থেকে)।

» এরাই প্রথম উম্মত—যাদের আল্লাহ তাআলা জিহাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর আগে আল্লাহ অবাধ্য জাতিদের প্রাকৃতিক আজাব দ্বারা সমূলে ধ্বংস করে দিতেন।

» আল্লাহ এদের অজস্র নিআমত দিয়েছিলেন। পরে তাদের অবাধ্যতার কারণে সমস্ত নিআমত কেড়ে নেন।

---

[১] *রিয়াদুস সালিহিন* : ১৮৭৬; হাদিসটি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

[২] সুরা হুদ, আয়াত : ৭০-৭১

বনি ইসরাইল সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা

উল্লিখিত সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যটি আমাদের একটু ভালো করে খেয়াল করা দরকার। আমরা নিজেদের ইতিহাস পড়ে জানতে পারি, মুসলিমরা একসময় দোর্দণ্ডপ্রতাপের সাথে শতাব্দীর পর শতাব্দী এই বিশ্ব শাসন করে গেছে। অথচ এখন সবখানে তারা নিদারুণভাবে নির্যাতিত-নিপীড়িত হচ্ছে—এটা দেখতেই যেন আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

আসলে ইসলামের একটা বৈশ্বিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিদ্যমান। অথচ এই ব্যাপারটা আজকাল আমাদের কল্পনাতেই আসে না। আর সে জন্যই ইসলামের অনেক বিধানের প্রজ্ঞাও আমরা বুঝতে পারি না। নাইন ইলেভেনের পর মুসলিমরা নিজেদের নাম পরিবর্তনের জন্য যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছিল, সেটা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে জাতি হিসেবে আমরা কতটা হীনম্মন্যতায় ভুগছি।

এই যে একটা চরম সম্মানজনক অবস্থা থেকে লাঞ্ছনার চূড়ান্ত পর্যায়ে নেমে আসা, এটা বনি ইসরাইল ও মুসলিম উভয়ের সাথেই ঘটেছে। বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, ইতিহাসের ঘটনা-পরিক্রমাগুলো যদি আমরা একটা গ্রাফে উপস্থাপন করি, তাহলে দুটো জাতির অবস্থা পরিবর্তনের যে ক্রম দেখা যাবে—তার মধ্যে কোনটা বনি ইসরাইলের আর কোনটা মুসলিমের—তা আলাদা করাই দুষ্কর হয়ে পড়বে! অর্থাৎ আমরা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছি।

তাই বনি ইসরাইল সম্পর্কে জানার সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয়তা হলো তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আমাদের মাঝে তাদের কাণ্ডকীর্তি নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করার একটা প্রবণতা আছে। অথচ আমরা একবারও ভেবে দেখি না যে, অনুরূপ স্বভাব আমাদের মাঝেও আছে কি না কিংবা আমরাও তেমনটা করছি কি না। তাদের কাহিনি পড়লে আমরা বুঝতে পারব যে, আল্লাহর সাহায্য কোনো জাতির কেনা স্থায়ী সম্পত্তি নয় যে, চাইলেই আকাশ থেকে নেমে আসবে। এটা শর্তসাপেক্ষ, অর্জন করে নিতে হয়। তার মানে—সিরিয়াতে, ফিলিস্তিনে কচুকাটা হওয়া নিষ্পাপ শিশুদের মুখ দেখে আল্লাহ কোথায়, আল্লাহ কেন এগুলো ঘটতে দিচ্ছেন—এসব প্রশ্ন অমূলক। এরপর থেকে আমরা অনুধাবন করব যে, এগুলো আমাদেরই কর্মফল, আমাদেরই উদ্যোগ নিতে হবে অবস্থার পরিবর্তনে। তাই ঘুরেফিরে এই পুরো বই জুড়ে আমরা নিজেদের প্রশ্ন করব—আমরা কি সেই সব স্বভাব ধারণ করছি, যার কারণে আল্লাহ বনি ইসরাইলের ওপর থেকে তাঁরই দেওয়া নিআমতসমূহ উঠিয়ে নিয়েছিলেন?

শাম ও মিশরের যোগসূত্র

আল্লাহ কুরআনুল কারিমে বনি ইসরাইলের যেসব কাহিনি উল্লেখ করেছেন তার সিংহভাগেরই কেন্দ্রীয় চরিত্র মুসা আলাইহিস সালাম ও তার সময়ের লোকেরা। আমরা যারা মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েছি, আমাদের প্রায় সবাই হয়তো কমবেশি মুসা আলাইহিস সালাম ও ফিরাউনের নাম শুনেছি। ফিরাউন যে মিশরের রাজা ছিলেন সেটাও হয়তো জানি; কিন্তু আগেই আমরা উল্লেখ করেছি, বনি ইসরাইলের প্রজন্ম বেড়ে উঠেছিল শাম এলাকায়। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠা উচিত, বংশানুক্রমে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বসবাস যদি শাম দেশে হয় এবং সেটাই বনি ইসরাইলের দাবিকৃত আবাসভূমি হয়, তবে মিশরে তারা কীভাবে গেল? কীভাবে তারা মুসা আলাইহিস সালামের সময়ে মিশরে অবস্থান করছিল?

কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলি আমরা বিচ্ছিন্নভাবে জানি; কিন্তু যোগসূত্রটা স্থাপন করতে ব্যর্থ হই বলে সামগ্রিক ছবিটা আমাদের সামনে ফুটে ওঠে না। আসলে এই দুই জায়গার মাঝে সংযোগ স্থাপন করেছে 'সুরা ইউসুফ'-এর কাহিনি।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম হলেন ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ছেলে। তার ভাইরা হিংসার বশবর্তী হয়ে তাকে কূপে ফেলে দিয়েছিল। সেই কূপ থেকে উদ্ধারকারীরা তাকে ক্রীতদাস হিসেবে বিকে দিয়েছিল মিশরে। তার ক্রেতা ছিল সেখানকার একজন কর্তাস্থানীয় ব্যক্তি। আল্লাহর সুনিপুণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে একসময়

ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিশরের মন্ত্রী হন।[১] তার ভাইদের চক্রান্তও ফাঁস হয়ে যায়। ইউসুফ আলাইহিস সালাম ক্ষমার অসামান্য নিদর্শন স্থাপন করে তাদের মাফ করে দেন এবং তার পরিবারের সকল সদস্যকে মিশরে নিয়ে আসেন। এই হলো শাম ও মিশরের মাঝে সম্পর্ক। মিশরে অবস্থানকৃত বনি ইসরাইলের মাঝেই আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেছিলেন।

এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ করার মতোন—ইউসুফ আলাইহিস সালামের মতো একজন ভিনদেশি কীভাবে হঠাৎ করে এত কর্তৃত্বশীল পদ পেলেন। কিছুটা অস্বাভাবিক বৈকি! অবশ্য ইতিহাসের আলোকে দেখলে ব্যাপারটা আর খাপছাড়া মনে হয় না। কারণ, ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হলেন, তখন মিশরের শাসনক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিবর্গ নিজেরাই ছিল ভিনদেশি, অমিশরীয়।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, এই জাতির নাম ছিল হিক্সস (Hyksos)।[২] তারা ১৭২০ খ্রিষ্টপূর্বে মিশরের শাসনক্ষমতা দখল করে। যতদিন তারা ক্ষমতায় ছিল, ততদিন বনি ইসরাইল মিশরে মোটামুটি সম্মানের সাথেই অবস্থান করেছে; কিন্তু ১৫৬০ খ্রিষ্টপূর্বের দিকে মিশরীয়রা ভিনদেশি হিক্সস জাতিকে দূর করে দিয়ে নিজেরা শাসনক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে। এই সময়টা প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে 'New Kingdom'-এর সূচনাকাল হিসেবে পরিচিত।[৩]

এখানে কুরআনের একটা দারুণ ভাষাগত অলৌকিকতা (linguistic miracle) রয়েছে—যা আমরা অনেকেই জানি না। কুরআন যতবার ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময়কালে মিশরের রাজার কথা উল্লেখ করছে,[৪] ততবার তাকে 'মালিক' (Malik বা king) হিসেবে সম্বোধন করেছে, ফিরাউন হিসেবে নয়।[৫] ফিরাউন হিসেবে

---

[১] বিস্তারিত সুরা ইউসুফ-এর তাফসির থেকে জানা যাবে।

[২] 'Egypt' in H. Lockyer, Sr. (General Editor), F.F. Bruce et al., (Consulting Editors), Nelson's Illustrated Bible Dictionary, 1986, Thomas Nelson Publishers, p. 324.

[৩] পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

[৪] সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৪৩, ৭২

[৫] সহিহ বুখারির একটি হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মিশরে হিজরতের একটা ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে মিশরের শাসককে 'রাজা' (مَلِكٌ) বলেছেন; 'ফিরাউন' বলেননি।—*সহিহ বুখারি* : ২২১৭

উল্লেখ করছে কেবল মুসা আলাইহিস সালামের সময়কালে মিশরের যে প্রধান ছিল, তাকে।[১] এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটার বিশাল ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। আমাদের অনেকেরই ধারণা হচ্ছে মিশরের রাজা মাত্রই তাকে ফিরাউন বলে ডাকা হতো; কিন্তু ইতিহাস আমাদের জানায় যে, ১৫৬০ খ্রিস্টপূর্বে 'New Kingdom'-এর সূচনা হওয়ার পর থেকে মিশরের রাজারা ফিরাউন উপাধি গ্রহণ করে, তার আগে নয়।[২] অথচ বাইবেল এই দুই সময়ের মাঝে কোনো পার্থক্য করেনি, সেখানে সবসময়ই মিশরের রাজাদের ফিরাউন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে[৩]। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল কুরআন বা হাদিস কোনো স্থানের তথ্যই বাইবেল বা অন্য কোনো Judeo-Christian উৎস থেকে কপি করা নয়, বরং এর উৎস ঐশ্বরিক।

যা-ই হোক, ফিরাউন তথা মিশরীয়রা ক্ষমতায় আসার পর এক অন্ধ জাতীয়তাবাদ সমস্ত বিদেশির প্রতি তাদের ক্রোধান্বিত করে তোলে। যেহেতু হিক্সসদের সময়ে বনি ইসরাইল মিশরে এসেছিল, তাই তাদের প্রতিও শাসকগোষ্ঠীর ছিল প্রচণ্ড বিরাগ। এ সময় বনি ইসরাইলের সাথে দাস-দাসির মতো আচরণ করা হতো,[৪] তারা ছিল চরম নির্যাতিত ও অত্যাচারিত।

এই পটভূমিতে যখন আমরা মুসা আলাইহিস সালামের কাহিনি কুরআনে পড়ব, তখন তা বুঝতে অনেক সহজ হবে, ইনশা আল্লাহ।

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ১০৪, সুরা ইউনুস, আয়াত : ৭৫

[২] পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

[৩] Genesis ৪১ : ১৪, ২৫, ৪৬—কয়েকটা উদাহরণ মাত্র।

[৪] সুরা শুরা, আয়াত : ২২

নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে মুসা আলাইহিস সালামের কাহিনি

ফিরাউন তখন বনি ইসরাইলের শাসক। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ রাজ্যের ছেলেবুড়ো সবাই। একরাতে ফিরাউন একটা স্বপ্ন দেখে।[১] সে সময় স্বপ্নকে খুব গুরুত্বের সাথে

---

[১] এই স্বপ্নের কথা আমরা জানতে পারি তাফসির থেকে (*তাফসির ইবনু কাসির*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত), কুরআন বা সুন্নাহ থেকে নয়।

এখানে জেনে রাখা ভালো যে, অনেক সময়েই তাফসিরকারকগণ ইহুদিদের কিতাব এবং লোককাহিনি থেকে প্রাপ্ত তথ্য কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে উল্লেখ করেছেন। যেমন—ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহর তাফসির অন্যতম নির্ভরযোগ্য একটি তাফসির, সেখানেও প্রচুর ইসরাইলি রেওয়ায়েত উল্লেখিত হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে ইসলামের প্রাথমিক যুগে নিষেধ থাকলেও পরবর্তীকালে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনি ইসরাইল থেকে বিভিন্ন জিনিস বর্ণনার সাধারণ অনুমতি প্রদান করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে জনগণকে (আল্লাহর বিধান) পৌঁছে দাও, যদি একটি আয়াতও হয়। বনি ইসরাইল থেকে (ঘটনা) বর্ণনা করো, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা (বা জাল হাদিস) আরোপ করল, সে যেন জাহান্নামকে নিজের আশ্রয় বানিয়ে নিল।—*সহিহ বুখারি* : ৩৪৬১

তাই সাহাবিগণ বিভিন্ন ইসরাইলি রেওয়ায়েত বর্ণনা করতেন। তবে এগুলোকে মোটেও আল্লাহ বা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য হিসেবে কিংবা ইসলামি আকিদার (বিশ্বাস) অংশ হিসেবে বর্ণনা করতেন না। তাই ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ তার তাফসিরের ভূমিকাতে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, এগুলো তিনি করেছেন কেবল 'শোভাবর্ধনের জন্য'। আমাদের সময়ে কোন তথ্যটা ইসরাইলি বর্ণনা থেকে প্রাপ্ত সেটা জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ, ইসরাইলি রেওয়ায়েত থেকে বর্ণিত কিছু ভিত্তিহীন কথাবার্তা উদ্ধৃত করে ইসলামের সমালোচকরা ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করে। তারা বলতে চায় যে, ইসলামে এসব কথা বলা আছে; কিন্তু আমাদের দ্বীনের অংশ তো শুধু সেটুকুই যা আমরা জানতে পারি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে। এ প্রসঙ্গে একটা সুন্দর লেখা পাওয়া যাবে এই লিংকে : https://cutt.ly/ZreTrJD

নেওয়া হতো, যা আমরা ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাহিনিতেও দেখতে পাই। কিছু স্বপ্নবিশারদ ফিরাউনের সেই স্বপ্নটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন—বনি ইসরাইলের ছোট্ট এক শিশু বড় হয়ে তার এই সাম্রাজ্য একদিন দখল করে নেবে। ভবিষ্যদ্বাণী ঠেকাতে তথা সাম্রাজ্য বাঁচাতে ফিরাউন বনি ইসরাইলের প্রতিটি ঘরে সদ্য-জন্ম-নেওয়া ছেলেশিশুদের হত্যা করতে থাকে।[১][২]

কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা সুনিপুণ। শত চেষ্টার পরও মুসা আলাইহিস সালামকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয় ফিরাউনের বাহিনী। কেননা, তার জন্ম হয়েছিল সকলের অগোচরে। আল্লাহ তখন তার মাকে নির্দেশ দেন মুসাকে নদীতে ভাসিয়ে দিতে। সেইসাথে প্রতিশ্রুতি দেন, ছোট্ট মুসাকে তিনি মায়ের বুকে ফিরিয়ে দেবেন।[৩] নিশ্চয়ই আল্লাহ কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না!

মুসা আলাইহিস সালামকে বহনকারী সিন্দুকটিকে অনুসরণ করছিল তার বোন। একসময় সিন্দুকটা এসে ঠেকে স্বয়ং ফিরাউনের প্রাসাদের সামনে। স্ত্রী আসিয়ার পীড়াপীড়িতে সিন্দুকের ভেতর পাওয়া শিশুটিকে ফিরাউন দত্তক নিতে রাজি হয়। কিন্তু শিশু মুসা কারও বুকের দুধই পান করছিলেন না! অবস্থা সঙিন দেখে মুসা আলাইহিস সালামের বোন জানায়, 'সে এক নারীকে চেনে, যিনি বাচ্চাদের দুধপান করান। তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। তিনি হয়তো এই শিশুটিকে দুধ পান করাতে পারবেন।' সেই নারী আর কেউ নন, তিনি ছিলেন মুসা আলাইহিস সালামের মা! এভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় দুধ খাওয়ানোর জন্য ছোট্ট মুসার কাছে তার মাকে পাঠানো হয়![৪]

একজন মা-ই কেবল বুঝতে পারবেন, মুসা আলাইহিস সালামের মা তখন কী কঠিন একটা সময় পার করেছিলেন! আল্লাহ তাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা কিন্তু মোটেও

---

[১] সুরা কাসাস, ২৮ : ৪, সুরা বাকারা, আয়াত : ৪৯

[২] এই জায়গায় আমাদের জন্য একটি বিশাল শিক্ষণীয় ব্যাপার রয়েছে। প্যালেস্টাইনের নিরীহ শিশুগুলোর নিষ্পাপ মুখ যখন আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ সৃষ্টি করছে, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে, ক্ষমতাসীনদের দ্বারা এমন পাশবিক কাজ যুগে যুগেই হয়ে এসেছে, এটা নতুন কিছু নয়।

[৩] সুরা কাসাস, আয়াত : ৭

[৪] এই পুরো ঘটনাটা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তবে বিচ্ছিন্নভাবে তিনটি সুরাতে। সুরাগুলো হলো—সুরা ত-হা, আয়াত : ৩৮-৪০; সুরা শুরা, আয়াত : ১৮; সুরা কাসাস, আয়াত : ৭-১৩। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ সুরাগুলো পড়ে দেখতে পারেন।

সহজ ছিল না। আল্লাহ কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না—কেবল এ কথার ওপর বিশ্বাস রেখে তিনি রবের আনুগত্য করেছিলেন সেদিন। এখানে আমাদের জন্য চমকপ্রদ একটি শিক্ষা রয়েছে। আর তা হলো, আল্লাহর ওপর ভরসা করলে শেষ ফলাফল সবসময় দারুণ হয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকাটাই হচ্ছে আসল চ্যালেঞ্জ!

মুসা আলাইহিস সালামের মা-ও আর দশজন সাধারণ নারীর মতোই ছিলেন, যার কিনা এই পরিস্থিতি সামাল দিতে মারাত্মক কষ্ট হয়েছিল। তার মানবীয় এই গুণটির কথা স্মরণ করে জীবনের কঠিন সব পরিস্থিতিতেও আমরা মনে সাহস জোগাতে পারব, ইনশা আল্লাহ।

মুসা আলাইহিস সালামের মিশর-ত্যাগ

ফিরাউন সমস্ত প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে শত শত শিশুকে হত্যা করেছিল কেবল একটি শিশুর আগমন ঠেকাতে। অথচ সেই শিশু তথা মুসা আলাইহিস সালাম লালিত-পালিত হতে থাকে তার নিজের ঘরেই।

মোটামুটি তরুণ বয়সে পৌঁছানোর পর একদিন মুসা আলাইহিস সালাম দেখলেন, একজন মিশরীয়র সাথে বনি ইসরাইলীয় একজনের বাক-বিতণ্ডা চলছে। তখন ইসরাইলীয়র পক্ষ নিয়ে তিনি মিশরীয়কে একটি ঘুসি দিতেই ওই ব্যক্তি মারা যায়। এটা ছিল একেবারেই অনিচ্ছাকৃত এবং তিনি সাথে সাথেই খুব অনুতপ্ত হন।[১]

একজন মিশরীয়র নিহত হওয়া তখনকার পরিস্থিতিতে খুবই গুরুতর ব্যাপার ছিল। কে এই হত্যাকারী—তাই নিয়ে হট্টগোল পড়ে যায় সবার মাঝে। কারণ, ঘটনাটা দিনের এমন সময়ে ঘটেছিল যখন আশেপাশে কেউ ছিল না। পরদিন দেখা গেল ওই বনি ইসরাইলীয় আবার আরেকটি ঝামেলা পাকিয়ে বসেছে এবং সে পুনরায় মুসা আলাইহিস সালামের সাহায্য চাইছে। তখন মুসা আলাইহিস সালাম বুঝলেন যে, দোষ ওই বনি ইসরাইলীয় লোকটিরই। তাই তিনি যখন ওকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, তখন সে বলে উঠল 'তুমি কি আজ আমাকে সেভাবে হত্যা করবে, যেভাবে গতকাল একজন মিশরীয়কে হত্যা করেছ?'

---

[১] এখান থেকে আমরা বুঝি যে, কোনো পাপই আল্লাহর ক্ষমার চেয়ে বড় নয়, যদি আন্তরিকভাবে তাওবা করা হয়।

ব্যস! এভাবে স্বজাতির মুখ দিয়েই বের হয়ে গেল সেই মিশরীয়র হত্যাকারী কে ছিল!

বলাই বাহুল্য ফিরাউন ও তার সভাষদগণ মুসা আলাইহিস সালামকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। জীবন বাঁচানোর জন্য তখন মুসা আলাইহিস সালাম শহর থেকে পালিয়ে গেলেন, রওনা হলেন মাদইয়ান অভিমুখে।[১]

মুসা আলাইহিস সালামের বিয়ে ও মাদইয়ানে অবস্থান

মুসা আলাইহিস সালাম মাদইয়ান পৌঁছালেন ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায়। এই অবস্থায় এক কূপের ধারে তিনি দেখলেন একদল লোক তাদের পশুকে পানি পান করাচ্ছে। আর তাদের পেছনে দুজন মেয়ে নিজেদের পশু নিয়ে অপেক্ষা করছে। লোকেরা চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা পানি পান করাতে পারছে না। তাই দেখে মুসা আলাইহিস সালাম তাদের পশুকে পানি পান করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি এক অসাধারণ দুআ করেন, যেটা আমাদের সবার মনে রাখা উচিত—

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

হে আমার রব, নিশ্চয় আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই নাজিল করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী।[২]

এই দুআ করার সাথে সাথেই যেন তার রিযিকের দরজা খুলে যায়। কৃতজ্ঞতাবশত মেয়ে দুটো তাকে নিয়ে যায় তাদের বাবার কাছে। পরে ঘটনাক্রমে এদের একজনের সাথে মুসা আলাইহিস সালামের বিয়ে হয়। মেয়েদের বাবার সাথে করা চুক্তি অনুযায়ী মুসা আলাইহিস সালাম মাদইয়ানে ১০ বছর অবস্থান করেন।[৩] এরপর তিনি রওনা হন মিশরের উদ্দেশে।

[১] এই পুরো ঘটনাটা বর্ণিত হয়েছে সুরা কাসাসে ১৫ থেকে ২২ আয়াত পর্যন্ত।

[২] সুরা কাসাস, আয়াত : ২৪

[৩] পুরো কাহিনি রয়েছে সুরা কাসাসের (২৮ নং সুরা) ২৩-২৮ নাম্বার আয়াতে।

নবুওয়াত-পরবর্তী মুসা আলাইহিস সালামের কাহিনি

মাদইয়ান থেকে মিশরে ফিরে আসার পথে মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছ থেকে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। আল্লাহ তাকে দুটি মুজিযা দান করেন এবং ফিরাউনের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর আদেশ করেন। মুসা আলাইহিস সালাম ফিরাউনের হাতে নিহত হবার আশঙ্কা করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে অভয় দেন। তবু মুসা আলাইহিস সালাম পুনরায় নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে কিছু দুআ করেন। নিজের সঙ্গী হিসেবে প্রার্থনা করেন তার বড় ভাই হারুন আলাইহিস সালামকে। আল্লাহ তার সবগুলো দুআই কবুল করেন। এসব দুআগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নিচের দুআটি, যা আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি; কিন্তু এই দুআ কে করেছিলেন, কোন সময়ে করেছিলেন—তা আমরা জানতাম না। জানলে হয়তো এর মর্মার্থ আরও ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারতাম—

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾

হে আমার রব, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন—যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।[১]

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ২৫-২৮

আগেই বলেছি, কুরআনে এই কাহিনিগুলো এসেছে বিচ্ছিন্নভাবে। যেমন : এই কথোপকথনের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটা যদি আমরা পেতে চাই তাহলে আমাদের সুরা ত-হা'র ৯ থেকে ৪৬ নং আয়াত এবং কাসাসের ২৯ থেকে ৩৫ নং আয়াতগুলো একত্র করে পড়তে হবে।

এখানে একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তাআলা যখন ফিরাউনকে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, তখন মুসা আলাইহিস সালামকে বললেন, তিনি যেন ফিরাউনের সাথে নম্রভাবে কথা বলেন![১] আল্লাহ তো জানতেনই যে, ফিরাউনকে দাওয়াত দিয়ে কোনো লাভ হবে না। তবুও মুসা আলাইহিস সালাম যেন আশা না হারান, সে জন্য তাকে বললেন, 'হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।' এখান থেকে আমরা দাওয়াতি কাজের খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি মূলনীতি পাই—**এক.** নম্রতা। **দুই.** আশাবাদ বা ইতিবাচক মনোভাব।

মুসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক ফিরাউনকে দাওয়াত প্রদান

নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর প্রথম যখন মুসা আলাইহিস সালাম ফিরাউনের সাথে কথোপকথন শুরু করেন, সেটা মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে সুরা ত-হা (আয়াত : ৪৭-৫২) এবং সুরা শুরায় (আয়াত : ১৬-৩৩)। ফিরাউনকে মুসা আলাইহিস সালাম মূলত দুটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন—

১) ফিরাউনকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে নতুবা

২) বনি ইসরাইলকে মুক্ত করে দিয়ে মুসার সাথে প্যালেস্টাইন যেতে দিতে হবে।

ফিরাউনের প্রতিক্রিয়া

একটি দাওয়াহ কোর্সে মুসা আলাইহিস সালামের সাথে ফিরাউনের কথোপকথন ও এর বিশ্লেষণ পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তখন বুঝতে পেরেছিলাম আজকের এই সময়ে এখান থেকে কত কী শেখার আছে! প্রথমে ফিরাউন এ-কথা সে-কথা নানা প্রসঙ্গ তুলে মুসা আলাইহিস সালামের বক্তব্যের মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করে; কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাম কথার খেই না হারিয়ে আল্লাহর পরিচয় দিয়ে যেতে

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ৪৪

থাকেন। এখান থেকে আমরা শিখি যে, অবিশ্বাসীরা নানা সাইড-টপিক তুলে আমাদের দাওয়াতি কাজের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে চাইবে। তবু তাদের অযথা কথার পেছনে সময় ও শক্তি ব্যয় না করে নিজেদের কাজ করে যেতে হবে।

যা-ই হোক, ফিরাউন যখন দেখল মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কথায় পেরে ওঠা অসম্ভব, তখন ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে চাইল। এ সময় মুসা আলাইহিস সালাম তাকে আল্লাহর দেওয়া মুজিযাগুলো দেখান; কিন্তু ফিরাউন সেগুলোকে সুস্পষ্ট জাদু হিসেবে আখ্যায়িত করে। সে মুসা আলাইহিস সালাম ও তার ভাইকে দেশ থেকে বের করে দিতে চায়; কিন্তু তখন তার সভাসদরাই তাকে পরামর্শ দেয়, তাদের যেন আরও কিছুদিন অবকাশ দেওয়া হয় এবং জাদুকরদের সাথে একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, জাদুকর কেন? তৎকালীন মিশরে জাদুবিদ্যার খুব সম্মান ছিল এবং তারা এটাতে খুব পারদর্শীও ছিল। যেহেতু মুসা আলাইহিস সালামের মুজিযাকে ফিরাউন জাদু হিসেবে সাব্যস্ত করেছিল, তাই তারা ভেবেছিল জাদুকরদের দক্ষতার মাধ্যমে মুসা আলাইহিস সালামকে পরাস্ত করা যাবে। তাছাড়া ফিরাউন যেসব জাদুকরদের নিযুক্ত করেছিল, তারা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ দল।

জাদুকরদের সাথে মুসা আলাইহিস সালামের প্রতিযোগিতা

ফিরাউন তার নিজস্ব জাদুকরদের ব্যাপারে এতই আত্মবিশ্বাসী ছিল যে, প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বসে এক উৎসবের দিনে। উদ্দেশ্য ছিল বহু লোকের সামনে মুসা আলাইহিস সালামকে পরাজিত করা; কিন্তু তার এই পরিকল্পনাই তার জন্য আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়ায়।

জাদুকররা ফিরাউনের কাছ থেকে অনেক পুরস্কার পাবার আশায় তাদের শ্রেষ্ঠ কৌশল প্রদর্শন করে, কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের হার মানানো কৌশল দেখাতে সক্ষম হন।

এখানে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, যখন যে সমাজে যে দক্ষতার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি, আল্লাহ তাঁর নবিদের ঠিক ওই বিষয়েই বিশেষ পারদর্শিতা দিয়ে পাঠান, যেন লোকেরা তাঁর আনুগত্য মেনে নেয়। মুসা আলাইহিস সালামকে যেমন জাদুবিদ্যাকে হার মানানো মুজিযা দেওয়া হয়েছিল, ঈসা আলাইহিস সালামকেও তেমনি এমন

এক মুজিযা দেওয়া হয়েছিল—যা তৎকালীন চিকিৎসাবিদ্যাকে তাক লাগিয়ে দেয়। কারণ, তখনকার মানুষের চিকিৎসাবিদ্যায় সুগভীর জ্ঞান ছিল। আর আমাদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানো হয়েছিল কুরআন দিয়ে যার পাতায় পাতায় রয়েছে ভাষাগত অলৌকিকতা। কারণ, তৎকালীন আরবরা তাদের ভাষাগত দক্ষতা নিয়ে খুব গর্ব করত।

মুসা আলাইহিস সালামের মুজিযা দেখে জাদুকররা উপলব্ধি করেছিল যে, এটা মানুষের পক্ষ থেকে আগত কোনো কৌশল নয়। তাই ফিরাউনকে হতভম্ব করে দিয়ে সকল জাদুকর সবার সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে ঈমান আনে। ক্রোধে উন্মত্ত ফিরাউন বলতে থাকে, নিশ্চয়ই মুসা আলাইহিস সালামের সাথে জাদুকরদের কোনো আঁতাত হয়েছে। তাই এভাবে দল পাল্টিয়ে ফেলেছে তারা। সে জাদুকরদের হত্যার হুমকি দেয়; কিন্তু তাদের ঈমান এতটাই মজবুত হয়েছিল যে, এ জন্য নিজেদের জীবন দিতেও তারা প্রস্তুত ছিল। ফিরাউন তৎক্ষণাৎ তাদের হত্যা করে।[১] এককালে যেসব জাদুকর ছিল ফিরাউনের অতি প্রিয় পাত্র, ঈমান আনার পর তৎক্ষণাৎ তাদের হত্যা করতেও ফিরাউন বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করল না। তাই আমরা যদি আশা করি যে, ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে আমরা যালিম শাসকদের বদান্যতা পাব, তবে তা দুরাশা মাত্র।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ঈমান আনলেই প্রাণ হারাতে হবে—এটা জানা সত্ত্বেও জাদুকররা কেন ঈমান এনেছিল? এর কারণ ছিল একটাই—জ্ঞান। জাদুবিদ্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বলেই তারা বুঝতে পেরেছিল—মুসা আলাইহিস সালাম কোনো জাদু দেখাননি, এটা দৃষ্টির কোনো কারসাজি নয়; বরং অতিপ্রাকৃত কিছু। এটা থেকে আমরা বুঝলাম যে, সত্য অনুধাবনের জন্য দুটো সহায়ক গুণ হলো—

১) জ্ঞান, সেটা যে ফিল্ডেরই হোক না কেন।

২) সত্যগ্রহণের ব্যাপারে নিরপেক্ষ এক হৃদয়, যাতে অহংকার নেই।

দ্বিতীয় বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। জাদুকরদের হৃদয় কলুষিত ছিল না, তাই তারা সত্যগ্রহণে পিছপা হয়নি। অথচ ঠিক উলটোটা ঘটেছিল ফিরাউনের ব্যাপারে।

---

[১] জাদুকরদের এই কাহিনির বিবরণ পাওয়া যাবে সুরা শুরা, আয়াত : ৩৭-৫১; সুরা ত-হা, আয়াত : ৫৮-৭৪ এবং সুরা আরাফ, আয়াত : ১১০-১২৬

জাদুকরদের ঘটনার পর ফিরাউন ও মিশরীয়দের প্রতিক্রিয়া

ফিরাউনের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন, সে ঠিকই সত্য চিহ্নিত করতে পেরেছিল, কিন্তু অহংকারবশত ঈমান আনেনি[১]। আর জাদুকরদের এই ঘটনা প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটেছিল, সবাই এটার কথা জানত, তারপরও খুব কমসংখ্যক লোকই ঈমান এনেছিল। বাকিরা সত্য অনুধাবন করতে পারলেও ফিরাউনের ভয়ে সাহস করেনি।

ফিরাউনের অনুসারীদের ওপর নানা ধরনের আজাব

ঈমান আনতে বাধ্য করার জন্য আল্লাহ ফিরাউনের অনুসারীদের ওপর নানা ধরনের আজাব পাঠালেন। এর মাঝে রয়েছে দুর্ভিক্ষ, তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ইত্যাদি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, যখনই কোনো বিপদ আসত তখনই তারা মুসা আলাইহিস সালামকে অনুরোধ করত, সে যেন তার রবের কাছে দুআ করে এই বিপদ সরিয়ে নেয়। তাহলেই তারা ঈমান আনবে এবং বনি ইসরাইলকে চলে যেতে দেবে[২]। অথচ আজাব সরিয়ে নেওয়া হলেই তারা তাদের করা সেই ওয়াদা বেমালুম ভুলে যেত।[৩]

মুসা আলাইহিস সালামের আগমনে বনি ইসরাইলের প্রতিক্রিয়া

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে—বনি ইসরাইলের প্রতিক্রিয়া। মুসা আলাইহিস সালাম যে তাদের জন্য প্রেরিত হয়েছেন, প্যালেস্টাইনে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন, এই পুরো ব্যাপারটাতে তারা তো খুশি ছিলই না, উলটো আরও বিরক্ত হচ্ছিল। সেটা তারা প্রকাশও করেছিল স্পষ্ট ভাষায়—

> *তারা বলল, আপনি আমাদের নিকট (নবিরূপে) আগমনের পূর্বেও আমরা (ফিরাউন কর্তৃক) নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনার আগমনের পরও নির্যাতিত হচ্ছি।*[৪]

[১] সুরা নামল, আয়াত : ১৪

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৩৪-৩৫

[৩] এই অভ্যাসটা কি চেনা চেনা লাগে? যখনই কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন, ভূমিকম্প বা অনাবৃষ্টি হয় আমরা আল্লাহর কাছে আকুল হয়ে দুআ করতে থাকি তা সরিয়ে নেওয়ার জন্য। ভাবি যে, আল্লাহ এবার রহম করলেই আমরা আল্লাহমুখী হয়ে যাব; কিন্তু যখন আল্লাহ সত্যি সত্যি আজাব সরিয়ে নেন, আমরা আবার ফিরে যাই আমাদের অবাধ্যতাপূর্ণ জীবনে।

[৪] সুরা আরাফ, আয়াত : ১২৯

অর্থাৎ তাদের আগের যে দাসত্বের জীবন, সেটাতে তারা এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তারা কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি ছিল না।

এই জায়গায় কি আমাদের সাথে তাদের কোনো মিল পাওয়া যায়? ইসলাম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নেই বলে, ইসলামি অর্থ ও আইন-ব্যবস্থা বর্তমানে অনুপস্থিত বলে আমাদের জীবনে একটার পর একটা সমস্যার আবির্ভাব ঘটছে। যার ফলে আমাদের জীবনও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। অথচ এগুলো প্রতিষ্ঠা করতে সামান্য যে ত্যাগের দরকার, সেটাও আমরা করতে রাজি নই। সুদভিত্তিক সমাজব্যবস্থার কথাই ধরুন, সুদের জন্য জিনিসপত্রের দাম আকাশচুম্বী, অথচ আমরা ব্যাংকের সাথে সুদভিত্তিক লেনদেন এবং সুদি ব্যাংকের চাকরি ইত্যাদি ছাড়তে প্রস্তুত নই একদমই!